স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন প্রক্রিয়া: ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ ধ্বংসস্তুপ হয়ে পড়ে। বাঙ্গালীদের জন্য যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন রাজনৈতিক নেতা বর্গ এবং দেশপ্রেমিক নাগরিকের তত্ত্বাবধানে স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন এর কাজে হাত দেয়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পূনর্গঠনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন দেশ নেতাগণ। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিছুদিনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি, ১৯৭০ এর নির্বাচনের পাকিস্তান সবার জন্য নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে নতুন রাষ্ট্রের প্রথম সংসদ গঠন করেন।

১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করে শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এবং রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব বিচারপতি আবু সাঈদ এর নিকট হস্তান্তর করেন।

আজ আমরা আলোচনা করব যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন এর প্রক্রিয়া এবং ধাপগুলো।

১. নতুন রাষ্টের সংবিধান প্রণয়ন:

শেখ মুজিব উনার অন্তর্বর্তী সংসদকে একটি নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব প্রদান করেন এবং চারটি মূলনীতি হিসেবে “জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র” ঘোষণা করেন যা মুজিববাদ নামেও পরিচিত।

বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে শেখ মুজিব স্বাক্ষর করেন ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর। মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রদানের ঘোষণা দেন ১৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু সরকার;

১৬ ডিসেম্বর থেকে নতুন সংবিধান কার্যকর করা হয় এবং ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনে শেখ মুজিব ও তার দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। শেখ মুজিব ঢাকা-১২ আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত সরকার গঠন করেন।

২. নতুন রাষ্ট্র পুনর্গঠন:

১৯৭১ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নয় মাস ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর সমগ্র বাংলাদেশ মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। শেখ মুজিবুর এই ধ্বংসযজ্ঞকে “মানব ইতিহাসের জঘন্যতম ধ্বংসযজ্ঞ” উল্লেখ করে ৩০ লাখ মানুষ নিহিত ও ২ লাখ নারীর ধর্ষণ হওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন।

১৯৭২ শেখ মুজিব মাত্র এক বছরের মধ্যে দেশ পুনর্গঠনের জন্য উল্লেখযাোগ্য কর্মসূচি হাতে নেন।

- প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন,
- সংবিধান প্রণয়ন,
- এক কোটি মানুষের পুনর্বাসন,
- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন,
- শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ,
- শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং
- মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ,
- মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন,
- ১১,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ ৪০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ,
- দুঃস্থ মহিলাদের কল্যাণের জন্য নারী পুনর্বাসন সংস্থা,
- মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুক্তিযাোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন,
- ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ,
- বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ,
- পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত ব্যাংক, বীমা ও ৫৮০টি শিল্প ইউনিটের জাতীয়করণ ও চালু করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারীর কর্মসংস্থান,
- ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ শিল্প-কারখানা চালুকরণসহ অন্যান্য সমস্যার মোকাবেলা করে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা

এই সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস চালান।

তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে আঁতাতের অভিযোগে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুনরায় চালু করেন।

ইসলামি গোত্রগুলোর জোর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মদ তৈরি ও বিপণন এবং জুয়া খেলা নিষিদ্ধ করেন। অত্যন্ত অল্প সময়ে প্রায় সব রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় ও জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের উল্লেখযাোগ্য সাফল্য।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়া হয়। ১০০ বিঘার বেশি জমির মালিকদের জমি এবং নতুন চর বিনামূল্যে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

গ্রাম বাংলার ঋণে জর্জরিত কৃষকদের মুক্তির জন্য তিনি “খাই-খালাসী আইন” পাশ করেন। গ্রাম বাংলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ও শিল্প-কৃষি উৎপাদনের জন্য পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বাোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন।

বঙ্গবন্ধু স্থানীয় সরকারগুলোতে গণতন্ত্রায়নের সূচনা করেন। তিনি ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভায় গণভাোটে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে প্রশাসনে জনগণ অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে।

১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি নাগাদ ১৩ মাসে ১০ কোটি টাকা তাকাবি ঋণ বণ্টন, ৫ কোটি টাকার সমবায় ঋণ প্রদান, কৃষিক্ষেত্রে আমুল পরিবর্তন, ১০ লাখ বসতবাড়ি নির্মাণ, চীনের কয়েক দফা ভেটো সত্ত্বেও জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ, ৩০ কোটি টাকার রিলিফ বিতরণ, ২ ফেব্রুয়ারি থেকে মিত্রবাহিনীর সৈন্য প্রত্যাবর্তন শুরুসহ দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু বিশাল কর্মযজ্ঞের আয়াোজন করেন।

৩. অর্থনৈতিক নীতি:

নব নির্বাচিত মুজিব সরকার গুরুতর কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, যার মধ্যে ছিল, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর পুনর্বাসন, খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবা উপকরণ সরবরাহ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি।

এছাড়া ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে এবং যুদ্ধের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও চরমভাবে ভেঙে পড়েছিল।

অর্থনৈতিকভাবে, মুজিব একটি বিস্তৃত পরিসরের জাতীয়করণ কার্যক্রম হাতে নেন।

বছর শেষ হতেই, হাজার হাজার বাঙালি পাকিস্তান থেকে চলে আসে, হাজার হাজার অবাঙালি পাকিস্তানে অভিবাসিত হয়, এবং এরপরও হাজার হাজার মানুষ শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে রয়ে যায়।

প্রায় ১ কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসন করার জন্য বৃহৎ সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

পর্যায়ক্রমে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে এবং দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ হওয়ার আশঙ্কাকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়।

৪. পররাষ্ট্র নীতি:

চার বছরের কম সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বাস্তবায়নে যে সাফল্য এনেছেন, তা বাংলাদেশের ইতিহাসে এখনো অদ্বিতীয় হয়ে আছে।

যেসব দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, তাদের সঙ্গেও তিনি বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন। এমনকি পাকিস্তানের স্বীকৃতিও আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

“কারো সাথে বৈরিতা নয়, সকলের সাথে বন্ধুত্ব” ছিল মুজিব সরকারের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ প্রায় ১১৩টি দেশের স্বীকৃতি লাভ করে।

শেখ মুজিবের সিদ্ধান্তক্রমে বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কনফারেন্স ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সদস্যপদ গ্রহণ করে।

বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভের পর শেখ মুজিব পাকিস্তানের স্বীকৃতি এবং ওআইসি, জাতিসংঘ ও জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের সদস্যপদ নিশ্চিত করেন।

৫. সামরিক বাহিনী গঠন:

শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী গড়ে ওঠে। নবগঠিত রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে তিনি সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য বিস্তৃত প্রকল্প গ্রফন করেন।

শেখ মুজিব খাদ্য ক্রয়ের পাশাপাশি বিদেশ থেকে সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়াোজনীয় অস্ত্র ও সামরিক সামগ্রী সংগ্রহ করেন।

যুগোস্লাভিয়ায় সামরিক প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে পদাতিক বাহিনীর জন্য আনা হয় ক্ষুদ্র অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজোঁয়া বাহিনীর জন্য ভারি অস্ত্র।

ভারতের অনুদান ৩০ কোটি টাকায় সেনাবাহিনীর জন্য কেনা হয় কাপড় ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। সাাভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মিগ বিমান, হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমান সংগ্রহ করা হয়।

৬. জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন:

শেখ মুজিবের ক্ষমতালাভের পরপরই, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-এর সশস্ত্র বিভাগ গণবাহিনী কর্তৃক সংগঠিত বামপন্থী বিদ্রোহীরা মার্ক্সবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে।

গৃহযুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা রোধে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করে ক্ষমতা গ্রহণের পর ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকার জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের ব্যাপরে একটি আদেশ জারি করেন।

এরপর ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের সরকারি আদেশ জারি করা হয়।

রক্ষীবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল সেনাবাহিনীর ছয় ভাগের এক ভাগ। শুরুর দিকে রক্ষীবাহিনী বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, চোরাচালানের মালামাল উদ্ধার করে এবং মজুতদার ও কালোবাজারীদের কার্যকলাপ কিছুটা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়।

৭. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা:

স্বাধীনতা পর অচিরেই মুজিবের সরকারকে ক্রমশ বাড়তে থাকা অসন্তোষ সামাল দিতে হয়। তার রাষ্ট্রীয়করণ ও শ্রমভিত্তিক সমাজতন্ত্রের নীতি প্রশিক্ষিত জনবল, অদক্ষতা, মাত্রাতিরিক্ত দুর্নীতি আর দুর্বল নেতৃত্বের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মুজিব অতিমাত্রায় জাতীয় নীতিতে মনোনিবেশ করায় স্থানীয় সরকার প্রয়োজনীয় গুরুত্ব লাভে ব্যর্থ হয়। আওয়ামী লীগ ও কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ করায় গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে।

এ সময় তৃণমূল পর্যায়ে কোন নির্বাচনই অনুষ্ঠিত হয় নি। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মধ্যে কমিউনিস্ট এবং ইসলামপন্থীরা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করায় ইসলামপন্থীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ পদে আপনজনদের নিয়োগ দেয়ার জন্য মুজিবের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনা হয়।

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ খাদ্য সংকট আরও বাড়িয়ে দেয় এবং অর্থনীতির প্রধান উৎস কৃষিকে ধ্বংস করে ফেলে।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব, দ্রব্যমূল্যের অসামঞ্জস্যতা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যর্থতার কারণে মুজিবকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়।

রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সংঘাতের মাত্রা বাড়তে থাকায় মুজিবও তার ক্ষমতা বাড়াতে থাকেন। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুজিব জরুরি অবস্থা জারি করেন।

এভাবেই স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী বাংলা পুনগর্ঠনে জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করে যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশ নির্মানে অগ্রণী ভুমিকা পালন করেন।